Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.27-36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কবিতার সম্প্রসারণশীলতা : উৎপলকুমার বসুর কাব্যকুশলতা

শিবশঙ্কর পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Utpalkumar Basu was the master of poetry, who can create a new tone through his incredible word composition, in a unknown way. This matter always attracts the reader. His words can travel in different direction, from the past to the future, from sea to sky, from light to dark keeping the present social ongoing and activity of human beings. His poetry is mixture of different thinking process, which involve the syntax order also. As a poet MR BASU always tries to do something different with a effective manner. Where a single sentence can create different meaning from different view. He sometimes give information like a reporter, like general public, like a legend. His poetry also include an Audio-visual effect with them, sounds unique. They have their own motion, own voice, video clipping image with them. The creativity of this poet can give a new direction to the world of Bengali poetry. From where anyone can find new structure, new thinking process and how to rethink about ongoing usual poetry. From his childhood he likes different work of craft. So a craftsmanship is available in his writing. Where different useless house hold materials take part with humanistic touch with them. His poetry are stretchable. Which can change the usual order of sentence. Which can find out many thinking process involve in the mind of poet. A poet sometime add something, subtracts something and thus his poetry comes with new form, new structure. Where general public, general life, society, time events all take part. The struggle of life, the happenings of mind, the activity of human nature all played a role in his writing. In this way his poetry can create a new formula of poetry. In his time he always tried to do something different from his own creativity. Which is still teachable for us. Which can bring change in the progress of Bengali poetry.

Key Words: Creativity, Audio-visual motion, New thinking, structure, multilayer effect.

পঞ্চাশের কবি উৎপলকুমার বসুর কবিতা প্রচলিত কবিতার বহুদূরে অবস্থান করে। তা যেমন ব্যতিক্রমী তেমনই সর্বত্রগামী, তা যেমন অন্তর্মুখী তেমনই বহির্মুখী -সুদূরপ্রসারী। স্বভাবতই উৎপলের কাব্যবলয় থেকে পাঠক তাঁর অন্বেষণে কবিতার বহুমুখীতা বা শতধারার স্রোতকে খুঁজে পেতেই পারেন। কবিতা কোন অভিমুখে পথ চলতে চাইছে, কী করতে চাইছে, কোন আদল বা ভাবনার কবিপ্রাণ এতে সক্রিয় আছে, সে সব জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে প্রশ্রয় পেতেই পারে। শব্দের বাঁধন বা শব্দের উচ্চারণ, বাক্যের গঠন বা বাক্যের প্রাণ, পাঠকের ভাবনায় নতুন রূপে ধরা পরতেই পারে। এসব কাব্যজিজ্ঞাসা নিয়ে পাঠকের

চিন্তা/চেতনা কবিতার প্রসারণশীলতার প্রান্তর রচনা করে। পঞ্চাশের কবি উৎপলকুমার বসুর কবিতা এভাবেই পাঠকের চোখে একটি সর্বত্রগামী কায়া/হিয়া নিয়ে জেগে ওঠে, যার ব্যাপ্তি চলমান বাংলা কবিতা থেকে বহুদূর বিস্তৃত। বস্তুত জীবনানন্দ পরবর্তীকালে কবিতাকে বহুমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে উৎপলকুমারের তুলনা পাওয়া দুষ্কর। যদিও শঙ্খ, শক্তি, সুনীলদের নিজস্ব স্বর বাংলা কবিতাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল, তথাপি উৎপলকুমার কবিতার ভাব ও গঠন নিয়ে সাহিত্যের একটা আদল সৃষ্টি করেছিলেন। যা কখনই একরৈখিক, একস্তরীয় বা একক ভাবের বিস্তার নয়। যেখানে বহু চিন্তা, বহু বিষয়, বহু মিশ্রণ নিয়ে কবিতার কায়া ও হিয়াকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস বর্তমান। প্রচলিত ধারার কাব্যপ্রকরণকে একেবারে দূরে রেখে কবি মেতে উঠেছিলেন আপন শিল্পে। তাঁর প্রথম কাব্য 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র উৎসর্গ পত্রের দ্বিতীয় চরণেই তিনি বললেন-"সূর্য ডোবা শেষ হল কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর।"—অর্থাৎ বহুপথ পরিক্রমা করবার কথাটি প্রথমেই তিনি ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ কী কবি একা ভ্রমণ করবেন? না সেখানে থাকবে সৃষ্টি উল্লাসের দিকচক্রবাল? না কী পাঠকেও উজ্জীবিত করবেন, নতুন নতুন পথের সন্ধান দিয়ে? এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে পাঠককে একটু পরিশ্রমী হতেই হয়। উত্তর পেতে গেলে বা কাব্যসৃজনের শিক্ষা পেতে গেলে, উৎপলের কাব্যকাননে অবগাহন ছাড়া উপায় নেই। যাক সেকথা, এখানে সূর্য বা চলমান বাস্তবতাকে নিয়ে উৎপলের কবিতা চলে যায় সমুদ্র অবধি, সেখানের ব্যবসা-নৌকা চলাচল, আর সিন্ধু সমাজের উতরোল কণ্ঠস্বর নিয়ে, তা পৌঁছে যায় নক্ষত্র অবধি, 'গত পূর্ণিমায়' কবিতায় থাকে 'জ্যোৎস্না'দের ঘরহারার কাহিনী। পাহাড়-পর্বত ঘুরে তাঁর কবিতা চলে আসে সুরের সরকার রোড, এণ্টালি, মগধ, বৈশালী থেকে রংপুরের কোন এক গ্রামের দিকে। তাহলে তাঁর কবিতা সূর্য, সমুদ্র, নক্ষত্র, পাহাড়, নাগরিক জনপদ থেকে চলে যায় গ্রামের দিকে। এই ভৌগোলিক ভ্রমণে কবি জারিত করে দেন তাঁর চিন্তা চেতনা, চলমান সময় থেকে জগতের কারবারের নানা দৃশ্যরূপ, কাহিনীর ছোট্ট ছোট্ট flash back. সেই দৃশ্যরূপে থাকে আলো অন্ধকার সকাল সন্ধ্যার গোধুলি রং। অর্থাৎ স্থানিক গমনাগমনের সাথে সেখানে থাকে দিনের নানা সময়ের অবস্থান। সকালে যেমন তিনি সূর্যলোককে মুঠোমুঠো তুলে খাবারের সাথে অনাহারী প্রাণ হিসাবে গ্রহণ করেন, তেমনি সন্ধ্যার গোধুলিতে প্রেয়সীর পিঠে দেখতে পান রক্তাক্ত পারদ আবার কখনও ভোরের কুয়াশায় দেখেন মরা পালকের পুঞ্জে শুয়ে থাকে পাখি। সকালের রৌদ্রে কখনও কখনও রাতের কাহিনী ঢাকা পড়ে যায়। দিনের আলোর নানা কর্মকাণ্ডকে সাথে নিয়েই রাতের অন্ধকারে তিনি দেখতে পান নৈশ ইস্তেহার, শহরের চারদিকে জ্বলে আগুন। সুতরাং পাঠকের অনুসন্ধানে উৎপলের কবিতা থেকে পাওয়া যায় স্থানিক ও কালিক অবস্থান। সেখান থেকে কবিতার সর্বত্রগামীতা বারে বারে জেগে ওঠে। এই কালিক অবস্থান হাজার বছরের নয়, তা একশ দুশ বছর থেকে কুড়ি তিরিশ বছরের পশ্চাৎপসারণ থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি ধৃত। তার বহু কবিতায় এই সময়ের আয়োজন আছে, যেখান থেকে বলা যায়, তিনি অতীত থেকে বর্তমানে সম্প্রসারণশীল, ভাবিষ্যতের দিকেও আগুয়ান। কবিতায় এভাবে স্থানাঙ্ক বা কালিক ভ্রমণ এর ক্ষিপ্ততা পাঠককে ভাবিত করে তোলে। কবিতায় বিভিন্ন স্থান বা সময়ের বিভিন্ন প্রহরে পদচারণা নতুন নয়। জীবনানন্দও বিদিশা বা নাটোর ঘুরেছেন, হাজার বছর বা 'পঁচিশ বছর পরে'র সময়কালে পা ফেলেছেন, কিন্তু উৎপল এই স্থানাঙ্ক বা কালাঙ্কে ভ্রমণ করেও একই কবিতার মাঝে সমরূপে অতীত ভবিষ্যতের মুখ উন্মোচন করে চলে আসেন বর্তমানের জমিতে। উৎপলের একই কবিতায় অতীত ভবিষ্যত ও বর্তমানের আয়োজনটি পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পরে—"যবে চার্ণকচাবি একদিন খুলেছিল কাপাশসিন্দুক... নাকি ছিল নুটিসূতা বাংলার তাঁতের – এই কলকাতায় গোবিন্দপুরের গ্রামে দোতলা বাসের গায়ে রোদ্দুর এলানো আছে সিল্কের মতন- একমাসব্যাপী তার শৌখিনতা দেখা যায়-রপ্তানি-মেলায়

শীত...ভবিতব্যতার কাছে হাত পেতে বসে আছে মালিক-দাদাল— পরস্পর মুখচুম্বনের আগে দেখে নিচ্ছে ঐ ভবিতব্যতার থেকে কতখানি দূরে গেলে আরবার চোর-চোর খেলা যাবে...জানি, বন কেটে বসত বসেছে—বসত উড়িয়ে দিয়ে বস্তি বসেছে —নিকাশি জলের ধারে বাজার বসেছে—

মনে হয় এই আমার সহজ হবার টাইম—" (সুখের কথা আর বোল না ২ : লোচনদাস কারিগর) — পাঠক এখানে সহজেই প্রত্যক্ষ করলেন গোবিন্দপুর কলকাতা আর সূতানুটি কেন্দ্রিক বাংলার তাঁতের ইতিহাস, আবার যেখানে থাকল বর্তমান সময়ের একমাসব্যাপী শীতের মেলা, বন কেটে বসত বা বস্তি তৈরি, নালার ধারের বাজার। আর এখানেই উৎপল রাখলেন মালিক দালালদের ভবিষ্যত চিন্তা। অর্থাৎ কালের তিনটি পরিসরেই উৎপল বাঁধলেন তাঁর কবিতা। প্রশ্ন হতে পারে এই অতীত ও বর্তমান ভ্রমণ জীবনানন্দ বা অন্যান্য কবিতেও উপস্থিত। 'বনলতা সেন'এ জীবনানন্দ অশোকের কালে গিয়েছেন, বর্তমানে ফিরেছেন-'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন / সন্ধ্যা আসে;' — কিন্তু সেখানে শেষ অবদি 'থাকে শুধু অন্ধকার', কবি ভবিষ্যতের দিকের পা বাড়ালেন না, কেননা তিনি এখন 'ক্লান্ত প্রাণ এক,'। পক্ষান্তরে হাংরির কবি উৎপল ভবিষ্যতের আয়োজনটিও করলেন, ভবিষ্যতে কিভাবে 'আরবার চোর-চোর খেলা যাবে' সেটারও ইঙ্গিত দিলেন। উৎপল এভাবেই হয়ত কবিতাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কবিতার কায়ায় ও হিয়ায় সামুহিক পরিবর্তন এনে বাংলা কাব্যজগতকে পুনর্বার জাগাতে চেয়েছিলেন, আর এসব করতে গিয়েই তিনি বলছেন-

"সূঁচের মতো ঢুকে পড়ো বিবিধ ফাটলে, কবিরা তো সহজেই
পাল্টায় নিজের ঘর, চামড়া বদল করে,"(বিজলীবালা : লোচনদাস কারিগর) কবিতার চামড়া বা শরীর গঠনের দিকেও তাঁর কবিতা কতটুকু সম্প্রসারণশীল, সেটাও পাঠক বুঝে নিতে পারেন। (কোন প্রেরণা থেকে কবি এসব করছেন, তা এখানে গোপন করা হল, কেননা তাতে উৎপল পাঠে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তাতে, পাঠকের আগ্রহে বহুবর্ণ বহুকৌণিক উৎপলের আরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে। পাঠকের উপর ভরসা হারানো মহাপাপ!) বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে সেখানে থাকছে কমা চিহ্নহীন টানা বাক্য, কখনও কমার পর কমা বা হাইফেনের পর হাইফেন ব্যবহার করছেন, যা সমরূপে গদ্য ও কবিতার মাঝামাঝি, টানা বাক্যের স্রোতে থাকছে একঝলক ছন্দের দ্যুতি, কখনও ভাঙছেন বাক্যগঠনের syntax কে। "জাগো, রাণা কমলালেবুর বীজ, প্রতাপের মতো," বা "শীতের সকাল —নুয়ে দেখছি গতরাত্রির বাফুনমালা — ছুঁয়ে দেখছি কালো পাথর—" বা "কেলা, কেলাসিত, কেলামঞ্জরী, জলকেলী, আমি একেলা, কারবাইট কেলা, মিশিয়ে ফেলা, কেলাবেচা, রথদেখা-" এই বাক্যবন্ধগুলি চিহ্ন ব্যবহারের দিকে, গঠনের দিকে, শব্দ ক্ষেপণের ক্ষেত্রে বাংলা কবিতায় নতুন আয়োজন নয় কী! কোন সময় কোনরকম চিহ্নবিহীন টানা কবিতা, কোন সময় কমার পর কমা, আবার মাঝে মাঝে হাইফেনের পর হাইফেন দিয়ে ভাবের ভারাতে কবিতাকে ধরতে চাওয়া -"আমার সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়শাসন—ভুল বিদ্যাশেখা—ভুল আবিষ্কার—ভুল প্রজনন—ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড—ভুল ধূপাধার—ভুল পুষ্করিণী—ভুল দেবদারু—ততোধিক ভুল স্মৃতি", এসব নিয়ে উৎপলের কবিতা কী বাক্যের বাঁধাধরা একঘেঁয়ে চলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়! পাঠক অবশ্যই সে বিষয়ে বিবেচনা করবেন। যাঁরা উৎপলের প্রবন্ধ, গদ্য বা কাব্যে চোখ রেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় এরকম চমকের পর চমক দেওয়া বাক্যসৃজন দেখেছেন। যা একই সাথে বাক্যকে চেনা ছকের বাইরে নিয়ে গিয়ে বহু দিকে, বহুরকম ভাবে সম্প্রসারিত করে। এভাবে কথা বলার ধরণ বাংলা কাব্য জগতে কোন লেখকের

রচনায় আছে, তা দেখতে গেলে হয়ত আমাদের নিষ্ফল পরিশ্রম হবে। বরং আমরা দেখে নিই উৎপলের বাক্যরা কি ভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে, টানা বাক্য কতদূর যেতে পারে-

"নিরক্ষর বেশ্যাদের (৮) চিঠিগুলি লিখে দিচ্ছি (৮) এই ফাঁকা তেষট্টিতে, (৮) মরিয়ম তোমার বাগানে, (১০) তোমাদের কার্পাস বাগানে, (১০) ঈশ্বরপ্রদত্ত গাধা চরছে একাই, (১৪) নিরক্ষর বেশ্যাদের চিঠিগুলি আমি লিখে দিচ্ছি (১৮) অতি পুরাতন বাবু ও দালাল ছাড়া (১৪) এই ফাঁকা তেষট্টির (৮) খেতজাঙালের পাশে আমার হাস্যকর (১৪) পাঠপ্রচেষ্টার খেলা আর কেউ দেখছে কি (১৪) আমার দ্বিধা-বিভক্তির টান আর কেউ বুঝে ফেলছে না তো,(২২) মরিয়ম, ভোর বেলা জানালার পাশে (১৪) শুনি রাজহাঁস ডাকছে নালায়, (১০) শাদা আমার চাদর দেখে (১০)—"(প্রকৃতির ছবি : পুরী সিরিজ) — এই টানাবাক্যের খেলা, কমার পর কমাচিহ্ন দিয়ে বাক্যকে অতিদীর্ঘ করেও একটা ছন্দের রেশ ধরে রাখা, সেটাও কী বাংলা কাব্যে অবিনব নয়! এটাও কী বাক্য প্রসারতার উৎপলীয় আবিষ্কার নয়! যেখানে ১৮২ মাত্রার দীর্ঘ গদ্যকবিতার চলন আছে, কোনরকম ঝাঁকুনি ছাড়া। ঝাঁকুনিবিহীন, পূর্ণচ্ছেদ বা বিস্ময়সূচক চিহ্নবিহীন, এরকম বাক্যবাণ উৎপলের 'পুরী সিরিজ'এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ঠ। আবার কবিতায় একই সাথে audio visual effect বা কবিতাকে motion দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে উৎপলের নতুন বাক্য আবিষ্কার আমদের স্তম্ভিত করে দেয়—

"জ্যোৎস্না এখানে নেই। তাকে কাল হাই-ইস্কুলের
পোড়ো বারান্দার পাশে দেখা গেছে। সে তার পুরনো
আধোনীল শাড়িটি বিছিয়ে ঐখানে শুয়েছিল।

'তুমি কোন ঘর ছেড়ে এলে? কোন দুঃখে? কোথায় চলেছ?'
কে যেন শুধালো তাকে। তার অস্ফুট উত্তর
হাজার ডানার শব্দে, নামতা-পড়ার শব্দে, নিরুত্তরে
চাপা পড়ে গেল–

ইস্কুলের বুড় ঘন্টি পাগল-ঘন্টির মতো বারবার আমাকে জানালো
'এখন সময় নয়। এত আগে কেউ কি এসেছে?' — (গত পূর্ণিমায় : চৈত্রে রচিত কবিতা) — কবিতাটিতে যে দৃশ্যরূপ (visual) ফুটে উঠেছে সেখানে আছে এক পূর্ণিমার রাতে এক মেয়ের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ছবি, হাই-ইস্কুলের পোড়ো বারান্দার পাশে আধোনীল শাড়ি বিছিয়ে শুয়ে থাকার ছবি। এই যে visual তার সাথেই আছে 'হাজার ডানার', 'নামতা পড়ার' motion. আবার'কোথায় চলেছ?' এই জিজ্ঞাসা, সেই গতিপথের গতির পরিচয়বাহী। এবং কবিতার শেষ চরণে, 'এত আগে কেউ কি এসেছে?' এ জিজ্ঞাসাও সেই motionকে শেষ পর্যন্ত গতিশীল করে তুলেছে। সুতরাং কবিতাটিতে জ্যোৎস্নার ঘর ছেড়ে চলে আসা থেকে কবিতাটি, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে সমান ভাবে এগিয়ে গিয়ে কবিতাটিকে চলৎশক্তি প্রদান করেছে। জাগিয়ে তুলেছে একটি চলচ্ছবির আলেক্ষ্য, যার গোটা প্রেক্ষিত জুড়ে পড়ে রয়েছে পূর্ণিমা রাতের আলো—নীল শাড়ি—নামতার আওয়াজ—পাগল ঘন্টির অবস্থান। সুতরাং সে চলৎছবিকে দেখতে বা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমাদের সংসারেও তো বহু বহু জ্যোৎস্না'রা বিভিন্ন দুঃখে ঘর ছেড়ে চলে যায়, চলে যেতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ জীবনের আরেক চলমান বহমানতাকেও যেন উৎপল তুলে ধরতে চেয়েছেন, নিরুদ্দিষ্টদের উদ্দেশ্যে কলম ধরেছেন, সমভাবে পাঠককে অনুসন্ধানে ব্রতী করতে পেরেছেন। অন্যদিকে পূর্ণিমার আলো ঝলমল রাতের আবহে উৎপল বহু মেয়ের জীবনের অন্ধকার দুঃখের দিকটি তুলে ধরে কবিতাটিতে একটি আলো-আঁধারের সেড (shade) দিতে চেয়েছেন। পূর্ণিমা রাতের সাদা আলো আর

শাড়ির নীল রং – কোথাও যেন একটু মৃত্যুচেতনাকেও জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়, কেননা জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে এসে কী করবে সেটা আমরা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারি না, মৃত্যুর পথেও তো সে পা বাড়াতে পারে! এই আবহে 'বুড়ো ঘণ্টি' বা 'পাগল-ঘণ্টি' সেই অনিশ্চিত গতিপথে বা বিপদশঙ্কুল পথে টেনশনের একটা audio effect প্রদান করেছে। পাগলা ঘন্টি তো বিপদের সঙ্কেত বা ইস্কুলের বুড়ো ঘণ্টিতো ছুটির সংকেত – তাই এই শব্দগুলো alarming audio emergencyর পরিবেশকে তুলে ধরতে চেয়েছে। কবিতাটি আবার একই সাথে গল্প হয়ে উঠতে চায়, ঘরছাড়ার ঘরহারার গল্প। উৎপল এরকমই, তাঁর কবিতা রহস্যময়, আবার একই কবিতার ভিতরে থাকে বিবিধ চিন্তার অতি সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক অবস্থান, সেখান থেকে বহু দিকের ইশারা দিয়ে যায়। কখনও মানবিক, কখনও সাংকেতিক, কখনও সাংবাদিকের মতো উৎপলকুমার বসুর কথকতা কবিতা হয়ে যায়। পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্নায় কবি মানবী জ্যোৎস্নার অনুসন্ধানে পা বাড়ান। দিয়ে যান নানা ইশারা, পাঠককুল সে ইশারা ঠিকঠাক ধরতে না পারলে জ্যোৎস্নাদের ঘর হারার গল্প বা ছবি 'নিরুত্তরে চাপা পড়ে' যাবে। এভাবে 'গত পূর্ণিমায়', 'সাংবাদিক', 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি গল্প হয়ে যায়, কখনও সেখানে থাকে নাট্যাভাস, সৃষ্টি হয় নাটকীয় মুহূর্ত, প্লট বা কাহিনীর হাত ধরে উৎপলের কবিতা গল্প ও নাট্যাভাসের দিকে এগিয়ে যায়। বস্তুত তাঁর 'পুরী সিরিজ' এর সমগ্র কবিতায় নাটকীয় চলনের একটা আদল আছে, যেটা মাননীয় শঙ্খ ঘোষ নিজেই উল্লেখ করেছেন। আবার কবিতার মাঝেই থাকে গানের টুকরো ঝলক, "ভোলা মন ভোলা মনরে আমার", "তোদের মানবজনম রইল পতিত" বা পাতা ঝড়ার গান। উৎপলের কবিতা যে কোন দিকে এগিয়ে যেতে পারে। গল্প নাটক গানকে সাথে নিয়ে রচনা করতে পারে বাংলা কবিতার এক অভিনব কাব্যআঙ্গিক। সেই কাব্যকলার কারিগর উৎপল কখনও রেখে দেন ক্রাফ্টের ডিজাইন। আর ফেঙে যাওয়া, অব্যবহৃত বস্তুগুলো উঠে বসে কবিতার মুখে, জড়বস্তুদের সাথেই মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান এই ব্যতিক্রমী কবি—

"ভাঙা চশমা, ছেঁড়া খাতা, দু-টুকরো পেনসিল
আর ফাটা শ্লেট, খড়িগুলো, উল্টানো দোয়াতের কালি।" (ছায়াপথ) —(আমাদের মনে রাখতে হবে ছোট থেকেই বিভিন্ন রকম হাতের কাজে উৎপলের বিশেষ আগ্রহ ছিল, কবিতাগুলি যেন সেই হাতের কাজের নকশা, মননের বিকাশ।) এই অভিনব ভঙ্গিমায় কবিতাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করা, বিভিন্ন সাহিত্য মাধ্যমের একক আধার হিসাবে কবিতায় নানা ভাব ভাবনার মিশ্রণ ঘটিয়ে উৎপলের কবিতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পরতে চায়, পাঠক সেসব দিকের সঠিক সংকেত অনুধাবন করতে পারলে সেখান থেকে বেড়িয়ে আসে কবিতার নব নব আদল। পুনর্জন্ম ঘটে কবিতার, বিবর্তন আবর্তন আর ক্রমবিকাশ ঘটে বাংলা সাহিত্যের। এমন কী গদ্য কবিতার ভেদরেখাকে মুছে দিয়ে দিয়ে কথার চালে বিষয়/ঘটনা বা দৃশ্যকে তুলে ধরতেও উৎপল পারদর্শী। (তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলি দেখলেই বোঝা যায় কথার ধরণ গদ্য ও কবিতার মাঝামাঝি অবস্থান করে, সেখানে চলে আসে হিন্দি ভাষা, ইংরাজি, পূর্ববঙ্গ বা এপার বাংলার ভাষা, উপভাষা বা নিভাষা। উৎপল কেন এরকম করতে চান তার অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় তিনি এক নতুন ভাষা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যা দিয়ে গল্প কবিতা নাটক সব লেখা যায়। তাঁর 'বাংলাদেশের তরুণ কবিদের জন্য এক খোলা চিঠি' প্রবন্ধে সেসবের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন কবি।) তাই সে ভাষার খেলায় সরাসরি চলে আসছে রোজজীবনের হাটে বাজারের কথকতা-"ঐ ছেলেটা বাবু ঐ হারামজাদা দু'টাকা চায় ব্যাটাছেলে খেটে খা না আমরা মেয়েমানুষ বালবাচ্চা আছে কোথায় পাব দু'টাকা সেদিন দিইছি তাই বলে হপ্তায় হপ্তায় তোদের কী হারামজাদা মদ খাস বদমাইসি করিস আর আমাদের কাছে জুলুম আজ এক টাকা কাল দু'টাকা এই সেদিন দিলম..."(সেই লুডো খেলা ২) পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারবেন এ ভাষা বাজারের কথকতা,

কথার কথাকে সংরক্ষণ করার কাব্যিক মানসিকতা আবার ছেদচিহ্নহীন টানা বাক্য নিয়ে উৎপলকুমার বসুর অদ্ভুত কাব্যকুশলতা।

উৎপল কখনও ভ্রাম্যমাণ ('সুখ-দুঃখের সাথী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। / বাতাস বইছে বেরিয়ে-পড়ার বাতাস') -তাঁর বহু কবিতায় এই ভ্রমণ আছে। কখনও তিনি চক্ষুষ্মান('গেয়েছি গান দৃশ্যজগতের। চোখ ছিল। চক্ষুষ্মান পুরুষের বাচালতা ছিল।'), যা কিছু দেখছেন তাকেই কবিতায় কায়াতে আবদ্ধ করছেন, দেখা দৃশ্য তুলে ধরছে চলচ্ছবির রূপ। এই চক্ষুষ্মানতার কারণেই কবিতায় কখনও কখনও চলে আসছে সাংবাদিকতার ছাপ—

"থেকে গেল রাঢ়বঙ্গের এই ঢাল, এই ডাঙা জমি, পড়ে রইল
যোগিনীর পথে পথে ঘোরার পাদুকা-
ছেঁড়া কিছু অঙ্গবস্ত্র, খঞ্জনি ও পিতলঘুঙুর,
জলের পাত্র আর মাটির থালাটি বাইরেই তোলা রইল-
হ্যাঁ, একটা বস্তামতো থলির ভিতরে তেলচিটে বালিশ-চাদর
পাওয়া গেছে এবং মেডেল এক, নামহীন, হয়তো রুপোর,
ময়লায় কালো ও বিকৃত- এইসব সৌন্দর্যের মাধ্যে তার
শবদেহ পাওয়া গেছে, বয়েস অনেক, পাশ ফিরে শুয়ে ছিল,
ভ্রূণভঙ্গি নিয়ে, পা গুটিয়ে, হাতের আঙুল মুখেতে পোরা-
যেন মায়ের পেটের মধ্যে অনন্ত সাগরে ভাসছে।" (কবিতা নং ২০, টুসু আমার চিন্তা মনি)

রাঢ়বঙ্গের ঢালু জমি, ডাঙা, আর ধুলোর পথ দিয়ে কবিতাটি চলতে শুরু করল। সেই পথে চলতে চলতে কবিও পেয়ে গেলেন ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্রের নমুনা। কার ব্যবহার্য? এক যোগিনীর। কী কী সেই ব্যবহার্য জিনিসপত্র? যোগিনীর পাদুকা, ছেঁড়া অঙ্গবস্ত্র, খঞ্জনি, পিতলঘুঙুর, জলের পাত্র, মাটির থালা, একবস্তা তেলচিটে বালিশ-চাদর, একটা রুপোর মেডেল। এসব বস্তুর মাঝেই তিনি পেয়ে গেলেন একটা শবদেহ-মৃত যোগিনীর শবদেহ আবার পরবর্তী জন্মের আয়োজন 'মায়ের পেটের মধ্যে অনন্ত সাগরে ভাসছে'। এসব কথার পরেও উৎপলে অনেক কিছুই বলার থাকে, বা অনেক না বলা ফাঁক থেকে যায়-সেকারণেই উৎপলের কবিতা এত হাতছানি দিয়ে যায়। জন্ম মৃত্যুর এই হিসাবকে সরিয়ে রেখে আমরা যদি কবির শুধু বর্ণনা বা দেখার চোখকে দেখি তাহলে কী দেখতে পায়? একজন সাংবাদিকের মত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবিবরণী দিয়ে গেলেন না কী? দেখিই না সে সাংবাদিকের চোখ কী কী দেখতে পেল!

★ প্রশ্ন -কোথায় শবদেহটি পড়ে ছিল? উ:- রাঢ়বঙ্গের ঢালে।

★ প্রশ্ন- কিভাবে পড়েছিল?, উ:- পাশ ফিরে শোয়ানো অবস্থায়, অনেকটা ভ্রূণভঙ্গির মতো, পা গোটানো ছিল, হাতের আঙুল মুখে ছিল পোরা।

★প্রশ্ন- বয়স কত হবে?, উ:- বেশ বয়স্ক।

★প্রশ্ন- শবদেহের আশেপাশে কিছু ছিল?, উ:- পাদুকা, ছেঁড়া শরীরের কাপড়, খঞ্জনি, মাটির থালা ইত্যাদি। উৎপল বসুও যেন 'একঝলকে' একটা মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করে গেলেন, তার খুঁটিনাটি বর্ণনাও দিয়ে গেলেন। সবশেষে 'মায়ের পেটের মধ্যে' পরবর্তী জন্মের আগমন সংবাদও দিলেন।

উৎপল সময়ে সময়ে রহস্যময়, আলো আঁধারের পথগামী আবার কখনও কখনও সংকেতধর্মী— "ধোঁয়াপাহাড় — শুয়োরমাথা বন —... তোমার তীরবেঁধা শরীর আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম — আমার

পকেটব্যাধ — চামড়াচর্চিত — পাতা ও প্রশাখার সন্তান — গোধিকারাধা তুমি — "(পকেটমার : খণ্ড বৈচিত্রের দিন) এসব সংকেতকে নিয়েও তিনি পথ চলেন, আর বলেন -"এ-দেহ সঙ্কেতময়, তুমি পড়ো, তুমি পাঠ করো, "(সংহিতা ২ : শ্রেষ্ঠ কবিতা)। নব নব আঙ্গিকের বাক্য রচনা করতে গিয়ে কবি নিয়ে আসেন তাঁর চেতনা, বোধ, অধিত জ্ঞান, দর্শন, সাংবাদিকতা, চক্ষুষ্মানতা, ভ্রাম্যমানতা। অবচেতন মন থেকে মনস্তত্ব, ইতিহাস ভুগোল থেকে রসায়ন, ভৌতবিজ্ঞান। প্রকৃতি ভাবনা, সময়-সমাজ-মানব ভাবনা থেকে জাত শব্দরাজী তখন কবিতার কায়াতে জাগায় হিয়ার স্পন্দন, তখনই কবিতা হয়ে উঠছে সর্বত্রপ্রসারী। উৎপলের কবিতায় বিবিধ বিষয়ের, বিবিধ ভাবের একত্র সমাবেশ, কবিতাকে বাঁচতে শেখায়, পাঠকের চোখে ও মনে যারা বারবার নতুন করে জেগে ওঠে। "আমার / স্বপ্নের ভিতর চলে যায় পদ্মাবোট / আরোহী বিহীন।" বা "কেবল পাতার শব্দে আমি আজ জেগেছি সন্ত্রাসে।", "আজ বিস্মৃতিই প্রিয় পরিচারিকার মতো ঘরদোর সাফ করে", "শেফালিগুচ্ছের গন্ধ বারবার বলে ওঠে : / মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কোনও।" —তখন তাঁর ভাবকে আমরা আত্মস্থ করতে পারি। আবার সময়ের সমাজের মানুষের কথা যখন জেগে ওঠে, তখন কবিতায় আরোপিত হয় প্রাণ, রহস্যময় কবিই হয়ে ওঠেন বাস্তবের মানুষ। কবিতার শরীরে লাগে জীবনের স্পর্শ—

"মূক তুমি তাকিয়ে রয়েছ ঠান্ডা ভাতের থালার দিকে
কী দেখছ তুমি জানো আর জানে আধ-হাতা ডাল
নুনের সঙ্গে ভিজে মাখামাখি, চালে হলুদ কাঁকর
ধানের পোড়াটে খোসা, তুমি জানো, যথার্থই জানো...
গ্রাসের আগের মুহূর্তে ঠিক যে-যার মতন
নিজস্ব বিশ্বাসে কাঁপছে — ভাত, ঝোল, নুনের আঙুল —"(সই লুডো খেলা ৩ : লোচনদাস কারিগর) —এসব উচ্চারণ বা বাস্তবতা কী কবিতায় প্রাণ স্পন্দন জাগায় না! কবিকে কী সহজ সরল জীবনবাদী মনে হয় না! কবিতার শরীর ও আত্মা কী সমরূপে পাঠককে উজ্জীবিত করে না! এসব জিজ্ঞাসা অবশ্যই পাঠককে উৎপল পাঠের হাতছানি দিয়ে যায়। উৎপলের কবিতায় মানব ভাবনা বা প্রকৃতি ভাবনা বা সমাজ ভাবনা, পরিচিত কাব্যআঙ্গিককে ভেঙে চুরে নতুন করে জেগে ওঠে, যেখান থেকে বাংলা কবিতা আরও আরও পথ পরিক্রমা করতে পারে। কবিতার আয়োজন ও আওয়াজ দিকচক্রবালে ছড়িয়ে পরতে পারে। রাস্তার ভিখিরীদের দেখে উৎপলের মনে হয় তাঁরা যেন সুরসুন্দরী, হলেবীদ মন্দিরের স্ত্রী যক্ষ মূর্তিকে কবি নির্দিধায় 'দিদি' বলে সম্বোধন করেন, তাঁকে মধ্যবিত্ত সংসারে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। মধ্যবিত্ত সংসারে একটি চাকরির জন্য মায়ের মানত বা মুদির দোকানের হিসাবের অঙ্কে মিশে যায় সংসারের অভাব অনটনের ছবি। আর এভাবেই মানুষ থেকে প্রকৃতি, জীবন থেকে যন্ত্রণা, মহামারী, বেকারবিপ্লব, গোমড়ক, আদিবাসী গ্রামের উচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত হয় তাঁর কবিতার প্রাণ। চাঁদ দেখে তাঁর যেমন কেন্দ্রীয় কৃষিসমবায়ের কথা মনে পড়ে তেমনি একটি ছোট্ট ফুলও কবির চেতনায় ফুটে ওঠে—

"বাড়ি ফিরে দেখি, বারান্দায়, টবের গাছে, ছোট এক
শাদাফুল ফুটে আছে। এ-ও কী সম্ভব। আমার অবিশ্বাসী
দুই চোখ জলে ভরে যায়।... এই প্রসূতি
এবং তার শিশুটিকে নিয়ে কী করব ভেবেই পাই না।...

এদের জন্য রৌদ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। চাই বাতাস এবং জল সুশীতল। এবং কিছুটা খাদ্য।"(সুখ-দুঃখের সাথী ২৮ নং)— এই ছোট্ট ফুল ও গাছটিকে দেখে তাদের প্রসূতি ও শিশুরূপে কল্পনা, তথা কবির চোখের জল কবিতাটিকে মানবিক করে তোলে। নতুন চিন্তা, বাস্তব ও কল্পনা কবিতার প্রথমেই প্রাণের স্ফুরণ ঘটায়। আর জানিয়ে যায় বৃক্ষ সংরক্ষণের কথা। উৎপলের বহু কবিতায় এই নব চিন্তার আয়োজন আছে, যা কবিতাকে নতুন করে পথ চলতে শেখায়। প্রকৃতি চেতনা মিশে যায় নব নব কাব্যকথায়—

"খাই প্রচণ্ড খিদের মুখে, শীতসকালের রোদ চাই ভিজিয়ে।
খাই কুয়াশা-মাখানো মুড়ি, ধোঁয়াগন্ধ গাছপালা, স্মৃতি নাম্নী ফেনাভাত,"(সুখ-দুঃখের সাথী ১৩ নং) — শীতসকালের রোদকে চায়ের সঙ্গে মেশানো, মুড়ির সাথে কুয়াশা, ফেনাভাতের সাথে স্মৃতির মিশ্রণ অবশ্যই অভিনব, যার বিস্তৃত উল্লেখ মাননীয় জয় গোস্বামী তাঁর "পুরী সিরিজের কবি" গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেখানে একবার নজর রাখতে পারেন। কবিতার বাক্য শব্দ চিহ্ন গঠনের ক্ষেত্রে, কবিতার ভাব ভাবনার ক্ষেত্রে উৎপলের কবিতা সূচনা করতে পারে নব নব দিগন্তের। আবার এই কবি কখনও নির্জন , একাকী হয়ে গ্রামের দিকে পা বাড়ান, কখনও মিস্টিকধর্মী, ভ্রমণপিপাসু, চক্ষুষ্মান, সাংবাদিক। সম্পূর্ণ বিপরীত সত্তা নিয়ে কখনও জেগে ওঠেন প্রত্যন্ত প্রদেশে, লোকাল ট্রেনে, অনন্ত কোলাহলে। তবে কোনরূপ উপদেশ বাক্য ছাড়া সেখানে শুধু থাকে বিষয়, ভাবনা, অনন্ত চিন্তালতার কাব্যকুশলতা। আর এসব নিয়েই উৎপলের কবিতা যে কোন দিকে সম্প্রসারিত হতে পারে-"আমার জন্য শুধু লেখা শুধু ভাষা ও প্রতীক

সমুদ্র-পথের রাত্রি — অকম্পাস, অনিশ্চিত দিক।"(অগ্রন্থিত কবিতা ৩৬ নং) তিনি যে পথ থেকে বেপথে পরিভ্রমণ করবেন, যে কোনদিকে চলে যাবেন তার উল্লেখ 'কবির উত্থান' কবিতাতেই তো জানিয়ে দিয়েছেন-"সবুজ অন্তর/ ফেটে শৈবালের সন্তানের মতো যাঁর জন্ম ছিল —/ তাঁরই বার্তা উন্মার্গের গোধুলিতে এখন উঠেছে, " — এই উন্মার্গের পথই আলো আঁধারের গোধূলি নিয়ে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার একরৈখিক পথ নির্দেশ করা যায় না। কবিমানসের অতলে ডুব সাঁতার লাগালে সেখানে পাওয়া যায় বহুস্তরীয় জগতের একত্র সহাবস্থান। যা মনোজগত, বস্তুজগত, ধূসরজগত, অধীত জ্ঞানজগত, পর্যবেক্ষণ জগত, সংশ্লেষণ মূলক পরীক্ষাজগত নিয়ে উৎপলকে এক অনন্য সাধারণ কবিতে পরিণত করে। বাংলা কবিতাকেও নবরূপে নবপ্রাণে জাগিয়ে তোলে। উৎপলের এই 'সবুজ রহস্যময় আত্মা' যে দিকচক্রবাল রচনা করে তার অলিতে গলিতে পড়ে থাকে কবি সৃজিত অভিনব চিন্তাচেতনার রজত কণা। আবার কখনও সহজ সরল হয়ে কবি "দু-হাত উঁচুতে ছুঁড়ে গান ধরে — ভোলা মন, ভোলা মন রে আমার।" উৎপলের কবিতা-পাঠকের চোখে, পুনঃপাঠের শেষে, মননের আবদারে নানা কলেবর, নানা প্রাণস্ফুরণ নিয়ে —বাংলা কবিতাকে নতুন অভিমুখে পরিচালনা করতে পারে। জীবনানন্দ পরবর্তী কালে বাংলা কবিতার শতমুখ খুলে দিতে পারে। একটি শব্দ, একটি বাক্য, একটি উচ্চারণ, একটু আলো আঁধার, একটু আত্মঅন্বেষণ, একটু জীবন দর্শন — বাংলা কবিতাকে দিক দিগন্তে প্রসারিত করে দিতে পারে। কবিতাকে কীভাবে সম্প্রসারিত করতে হয়, কীভাবে বুনন আর মননের মেলবন্ধন ঘটে সেসবের একটু উল্লেখ না করলে এ আলোচনা বোধহয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদিও প্রবন্ধের নামানুসারে আমরা শুধু উৎপলকুমার বসুর কবিতার সম্প্রসারণশীলতা- কাব্যকুশলতা দেখতে চেয়েছি, তথাপি সেসবের কারিগরি একটু উল্লেখ করলে, পাঠককুল নিশ্চয় রুষ্ট হবেন না! হয়তো তাঁর কবিতা গঠনের আদল আমাদের শিখিয়ে দিতে পারে বাংলা কবিতাকে কিভাবে সময়ের প্রয়োজনে, মনের আয়োজনে, গতানুগতিকতার বিয়োজনে নির্মাণ করতে হয়।

কীভাবে বাংলা কবিতাকে আরও একশ বছর এগিয়ে দেওয়া যায়। উৎপলের কবিতা কীভাবে জন্মলাভ করে তার উদাহরণ নিচের কবিতাটি-

”কিছুটা রহস্য থাকে ; কিছু অব্যয় আর দু-একটা প্রশ্নের চিহ্ন,
ছিটে-ফোঁটা ভাঙা শব্দ যা-দিয়ে সহজে সমাস বানানো যায়,
আর একমুঠো ক্রিয়াপদ; সিঁধ কাটা হয়েছিল —সেই দাগ;
ফাঁক ও ফোকর, আকাশ দেখার জন্য, বটগাছ...
আমার কবিতা হয় ঐ মতো।”(কবিতা নং ১১, সুখ-দুঃখের সাথী) - কবিতায় তাহলে কী কী থাকা প্রয়োজন? কিছুটা রহস্য, কেননা রহস্য না থাকলে বিমূর্ততা আসবে না, তাকে মূর্ত করার জন্য দিতে হবে অব্যয়ের ছোঁয়া, প্রশ্নের মাধ্যমে সে মূর্ততার সন্ধান করতে গিয়ে পাঠক পাবে বাস্তবতার মিল। সেখানে শঙ্খ ঘোষ কথিত নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টি হবে। ভাঙা ভাঙা শব্দ দিয়ে, শব্দসমাস নতুন মহিমায় জেগে উঠবে, থাকবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বাচক ক্রিয়াপদ। প্রয়োজনে কবি সিঁধ কেটে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিষয়কে ঋণ করতে পরেন, কিন্তু তার উপস্থাপনা হবে সম্পূর্ণ অভিনব- সম্পূর্ণ নতুন অর্থ সমন্বিত। সেখানে থাকবে ফাঁক-ফোকর, যেখান থেকে পাঠক কবিতার নব নব মাধুর্য্য বা অর্থ উদঘাটন করবে। পাঠকের উপর ভরসা করেই কবিতার নবজন্ম ঘটবে, কেননা স্বয়ং কবির মতে-“কবিতা আমরা জানি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা, পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী পদ্ধতি।” কবিতার ব্যকরণ কী হওয়া উচিত, কেমন করে সে ব্যকরণকে ফুলের মতো আহ্লাদ সহকারে ব্যবহার করতে হয়, সমাসকে হতে হয় দূর্বাদলের মতো কচি সবুজ, বাক্যের বাহারে লাগে অলঙ্কারের আভরণ, কীভাবে জেগে ওঠে বাংলার গোচারণ ভূমি,নদীপট, লতাবিতানের ঘ্রাণ— তার নমুনা যেন উৎপলকুমার বসুর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র সম্ভাষণ অংশটি—

“অয়ি, সাজাও আমাকে-ফুলডোরে, ফুলের মুকুটে, আহ্লাদে
বাগান উজার-করা কৃৎ ও তদ্ধিতে, দূর্বাদলের মতো
সবুজ সমাসে, কিছু যার ব্যতিহার, কিছু অলুক ও মধ্যপদলোপী
কর্মধারায় যেন, সন্ধি চাই, ঘোষ ও অঘোষ বর্ণে, চাই উপচীয়মান
বাক্যের বাহার, সোলা ও ঝিনুকে অলঙ্কৃত করে দাও, ইন্দ্রিয়জ
মুখস্থ অক্ষরে সাজুক মাতৃভাষা, সাজি আমি লোকপ্রাণ,
গোচারণে-নদীপটে-দূর বাংলার লতাবিতানের ঘ্রাণে। ”

-উৎপলকুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের ‘সম্ভাষণ’ অংশে এই সাতটি বাক্য স্থান পেয়েছে। (ব্যকরণ মানলে একটি বাক্য, কেননা শেষে মাত্র একটি পূর্ণচ্ছেদ আছে)। শুধু স্থানই পাইনি তাঁর কবিতার একটি সামগ্রিক আউটলাইন যেন, এই বাক্যবন্ধগুলি। কবিতাটি যেন কবিতার ব্যাকরণ, যা শুরু হচ্ছে একটি অপূর্ব নরম শব্দ দিয়ে- অয়ি। অয়ি স্ত্রী সম্ভোধন সূচক শব্দ, বা এর মোটা অর্থ ‘ওগো’ (রবীন্দ্রনাথও এই ‘অয়ি’ শব্দ ব্যবহার করেছেন-“অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী”) কবিতাটি পড়েই আমরা বুঝতে পারছি এটি ব্যকরণগত বিভিন্ন বিষয়কে কিভাবে কবিতায় ব্যবহার করা যেতে পারে তার ‘নোটিশ’ যেন-একপ্রকার প্রচারও বলতে পারি। তাহলে এটাও কী কবিতা আর ব্যকরণ বিজ্ঞানের একটা ক্রাফ্ট! একঝলকে আর কী কী দেখা যায়, আসুন দেখে নিই-

★ রঙ= সবুজ (গোটা কবিতাটিকে সজীব করে তুলেছে)

★ গোচারণ / নদীপট= বাংলা প্রকৃতির রূপ এঁকেছে।

★ ফুল/ লতাবিতানের ঘ্রাণ = গন্ধের আয়োজন করেছে।

★ দূর্বাদল= স্পর্শের নরম আয়োজন এখানে।

★নদীপট= দৃষ্টির পরিধি বাড়িয়েছে।

★ঘোষ বর্ণ= ধ্বনির নিনাদ যেন(কানে শোনার মতই)-

-যাঁরা গন্ধ-স্পর্শ-দেখা-শোনার বাইরেও স্বাদের আয়োজনটি অনুসন্ধান করছেন, তাদেরকে কী এখনও বলে দিতে হবে এ কবিতার স্বাদ আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি- সে স্বাদ শব্দে ব্যক্ত করি কী করে ! তাও তো 'উপচীয়মান'- সঞ্চিত হচ্ছে- ক্রমবর্ধমান হচ্ছে পাঠের পর পুনঃ পাঠে- উপ+√চি+মান(শানচ্).

—যাঁরা এই আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে উৎপলের কবিতার সম্প্রসারণধর্মীতার পরিচয় পেতে চান, তাঁরা উৎপলের যে কোন একটি কবিতায় চোখ/মন রাখলেই তার প্রমাণ পাবেন, সে কথা জোরের সাথেই বলা যায়। এখানে লেখক বা সমালোচক হিসাবে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য স্মরণ নিলাম স্বয়ং কবির একটি উক্তির—"আমাদের আরো ধূর্ত হতে হবে হতে হবে অবহিত এবং সম্প্রসারণশীল হতে হবে অতীত এবং ভবিষ্যতের উভয় প্রান্তে...কেন কবিতা লেখা হয়...আমাদের সম্প্রসারণশীল যাতায়াত পেতে হবে।" ('অন্তর্জলী' পত্রিকার সেপ্টম্বর-অক্টোবর ১৯৬৪ সংখ্যায় উৎপলকুমার বসুর 'ধর্মীয় দ্রুতলিখন' গদ্যর অংশ।)

উৎস:-

উৎপলকুমার বসু, *কবিতা সংগ্রহ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, অগ্রহায়ণ ১৪২২।

উৎপলকুমার বসু, *কবিতা সংগ্রহ ২,* দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, অগ্রহায়ণ ১৪২৪।

উৎপলকুমার বসু, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, আগস্ট ২০০৭।

উৎপলকুমার বসু, *সারাৎসার ১,* ভাষালিপি, ২৪ রাজা লেন, কলকাতা ৯, কলকাতা বইমেলা ২০১৭।

গৌতম মণ্ডল(সম্পাদক), *উৎপলকুমার বসু সংখ্যা,* আদম, কৃষ্ণনগর নদীয়া ৭৪১১০১, একবিংশ বর্ষ বৈশাখ ১৪২৩।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদক), *যোগসূত্র পত্রিকা,* অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৪ সংখ্যা, কলকাতা ১২।

শঙ্খ ঘোষ, *নিঃশব্দের তর্জনী,* আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫।